নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষ্যে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

(৯)

নারীশিক্ষা ও বিদ্যাসাগর

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ বন্ধ করার কঠিন আন্দোলনের পাশাপাশি নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি বিরল ও ঐতিহাসিক লড়াই করেছিলেন।

উনিশ শতকের শুরুতেই এদেশের রামমোহন-সহ আরও কয়েকজন নারীশিক্ষার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। কলকাতায় প্রথম মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮১৯ সালে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামক এক খ্রিস্টান সমিতির উদ্যোগে। সেগুলি ছিল ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল। মেয়েদের মধ্যে বাংলা শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮২২ সালে তাঁরা একটি বই প্রকাশ করেন, 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'। যদিও এসবের তেমন কোনও ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। ১৮২৪ সালে গঠিত 'লেডিজ সোসাইটি'র উদ্যোগে আরও কয়েকটি মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২৫ সালে গঠিত 'লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন' নামে আর একটি সংস্থা কলকাতার মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং কিছু মুসলিম পুরুষ এমনকি দু-এক জন মুসলিম মহিলাও এই কাজে তাঁদের ব্যাপক ভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে হিন্দু-মুসলিম কোনও অংশেরই সাধারণ নারীসমাজে এই উদ্যোগগুলির প্রভাব পড়েনি। এমনিতেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যাপারে ভারতীয় সমাজ ছিল মারাত্মক রক্ষণশীল। তার উপর, এই স্কুলগুলি সম্পর্কে জনমনে ধারণা ছিল, এদের আসল উদ্দেশ্য হল খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং এই ধারণার কিছু বাস্তব ভিত্তিও ছিল।

সে-সময় বাংলার বিভিন্ন জেলায় ধনী এবং কিছুটা উদারমনা ব্যক্তিরাও মহিলা বিদ্যালয় করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় কোনও উদ্যোগই ফলপ্রসু হচ্ছিল না। ইতিহাসের এই পর্বে উনিশ শতকের মধ্যভাগে এলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর রাজা তো ননই, ধনীও নন। কেবল তাঁর দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের, বিশেষত নারীদের দুরবস্থায় বেদনাহত এক মানুষ। ধর্ম-বর্ণ কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে ন্যুব্জকুব্জ দেশবাসীর ব্যথা তাঁকে কাঁদিয়েছে। অশিক্ষার সেই নিকষ তমসাকে ছিন্ন করে দেশবাসীকে আলো দেখাতে বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে হাত দিলেন এবং নারী-পুরুষ সহ সমাজের সকলের জন্য শিক্ষার লড়াই শুরু করলেন।

এই সময়ই বেথুন সাহেবের উদ্যোগে 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'বেথুন স্কুল') প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু শুধু স্কুল হলে কী হবে, মেয়েরা কি পড়তে আসবে? বাড়ি থেকে তাদের ছাড়বে? স্কুল চালনার ব্যাপারে বেথুনসাহেব বিদ্যাসাগরের সাহায্য চাইলেন। তৎকালীন সমাজের প্রবল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এবং অতীতের স্কুলগুলির করুণ ইতিহাস জেনেও বিদ্যাসাগর সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর একটাই লক্ষ্য, নারীসমাজ তথা দেশের মানুষকে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন গোঁড়ামির অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সভ্যতার আলোয় আনতেই হবে।

বিদ্যাসাগর নিজে মেয়েদের বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করলেন। তাদের বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্যদের ধৈর্য ধরে বোঝাতে শুরু করলেন। কারও বাড়িতে অপমানিত হলেন, কোথাও প্রত্যাখ্যাত হলেন, কোথাও বা একটু ক্ষীণ আশ্বাস পেলেন। যেখানে যতটুকু যা পেলেন তাকেই আঁকড়ে ধরলেন তিনি। বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা অনুমোদন করালেন। শুরু হল স্কুল। স্বঘোষিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা তেড়েফুঁড়ে উঠলেন। বললেন, 'শাস্ত্রে মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় নিষেধ আছে। বই পড়লে মেয়েরা বিধবা হবে। সমাজ উচ্ছন্নে যাবে।' তাঁরা বলতে শুরু করলেন, 'মেয়েদের কখনই ঘরের বাইরে বেরতে দেওয়া যায় না। তাদের স্বাধীনতা নেওয়া মানে সমাজের সর্বনাশ করা। মেয়েদের অবশ্যই শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন রাখতে হবে।' এইভাবে গোঁড়া পণ্ডিতদের দাপটে নারীশিক্ষার আয়োজন ফের একবার অতীতের কলঙ্কিত অধ্যায়ের মুখোমুখি হতে বসল।

তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আক্রমণের সামনে রুখে দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'শাস্ত্র কিছু আমিও পড়েছি। মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কথা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে দেখান।' পণ্ডিতের দল থমকে গেল, কিছুই দেখাতে পারল না। কিন্তু থমকেও তাঁরা থেমে গেল না। সমাজে তাঁদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল সাংঘাতিক। তাঁরা সর্বত্র নারীশিক্ষাকে শাস্ত্রবিরোধী বলে প্রচার করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর সারাদিন স্কুল-কলেজ সামলে রাত জেগে পড়তে লাগলেন যাবতীয় শাস্ত্রীয় পুঁথিপত্র। যেভাবেই হোক অপপ্রচারকারীদের মুখ বন্ধ করতে হবে। ওদের অস্ত্রেই ওদের ঘায়েল করতে না পারলে যে চলবে না, এ-তিনি বেশ বুঝতে পারলেন। অবশেষে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সমর্থনে শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করলেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' এবং স্কুলের গাড়ির গায়ে বড় বড় হরফে সেই শাস্ত্রবচন লিখিয়ে দিলেন। শুধু প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতের দলই নয়, বেথুন স্কুল শুরু হওয়ার পর নারীশিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার ডিগ্রিধারী দেশীয় একদল ব্যক্তিও। তাঁদেরও সমাজে, বিশেষত শিক্ষিতমহলে যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। এই ধরনের বিরোধীদের সঙ্গেও মতামতের তীব্র লড়াই হয়েছে বিদ্যাসাগরের।

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের অভূতপূর্ব এক দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হল। ১৮৫৭ সালের শুরু থেকেই গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় তৈরির কাজে হাত দিলেন তিনি। মে মাসে বর্ধমানের জৌগ্রামে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে ছেলেদের জন্য তিনি বেশ কিছু মডেল স্কুল করেছেন। সেভাবেই মেয়েদের জন্যও মডেল স্কুল নির্মাণেরও উদ্যোগ নিলেন। ছ-সাত মাসের মধ্যে হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া, মেদিনীপুরে মোট ৩৫টি বালিকাবিদ্যালয় তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এবং আরও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু এই সময়েই সংঘটিত হয় সিপাহিবিদ্রোহ। এই ঘটনায় হিন্দু-মুসলিম সিপাহিদের ঐক্য দেখে ইংরেজ শাসকরা ভীত হয়ে পড়ে এবং তাদের শাসননীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায় ভারতশাসন। শিক্ষা প্রসারের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জেলায় জেলায় স্কুল করার জন্য আর্থিক সহায়তার যে প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছিল তা থেকে তারা সরে দাঁড়ায়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর পড়ে গেলেন মহা বিপদে। তিনি সরকারকে চিঠি দিয়ে এই জটিল সমস্যার কথা বিশদে জানালেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা নির্বিকার থাকল। এই সময়েই ব্রিটিশ শিক্ষাবিভাগের নিয়ামকদের সাথে নীতিগত বিরোধের কারণে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ সহ সমস্ত সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তাঁর মাইনেপত্র সব বন্ধ হয়ে গেল। তার ওপর এতগুলি স্কুল সরকারের সাহায্য ছাড়া কোনও ভাবেই চলতে পারে না। অন্য যে-কেউ হলে সম্ভবত এই কারণটা দেখিয়ে স্কুলগুলি বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণকে জ্ঞানে-চেতনায় সোজা করে দাঁড় করাবার জন্য যে স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটির অকল্পনীয় সংগ্রামের কথা আমরা একটু-আধটু জানছি, তাঁর নাম বিদ্যাসাগর। স্বদেশের হিতসাধনে যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করতে যিনি নিজের সর্বস্ব নিয়ে সদা প্রস্তুত। সরকারি সাহায্য বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গড়ে তুললেন 'নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার'। সর্বাগ্রে নিজের সর্বস্ব দিলেন। তারপর আগ্রহী প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বোঝালেন এই বিশেষ প্রয়োজনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য। সাধারণের শিক্ষার জন্য এমন ঐতিহাসিক গণউদ্যোগের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরই।

প্রবল প্রতিকূলতার মোকাবিলাতে বিদ্যাসাগরকে নানা ভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। পরিস্থিতিকে খুব নিখুঁত ভাবে বিচার করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। কোনও কারণে যাতে আরব্ধ কার্যক্রম ব্যাহত না হয়, সেদিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়েছে। মূল উদ্দেশ্যকে রক্ষা করার জন্য কখনও এক পা এগিয়েছেন আবার কখনও এক পা পিছিয়েছেন। কেউ কেউ সেজন্য তাঁকে ভুল বুঝেছেন, তাঁর উপর অভিমান করেছেন, এমনকি তাঁকে দোষারোপও করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সমস্ত কিছুই অটল পর্বতের মতো সহ্য করেছেন এবং অতলান্ত ধৈর্যের সাথে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষ গড়ে তোলার কাজ করে গেছেন।

(চলবে)

স্মরণ দিবসে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

ছয়ের পাতার পর

থাকতে পারি? আজ এটা ইতিহাস, সত্যকে অবলম্বন করে সঠিক লাইনের ভিত্তিতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের এই সংগ্রাম কত দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল। সঠিক তত্ত্ব এবং সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণের অপরিহার্যতার কথা কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার স্মরণ করিয়েছেন। আপনারা জেনেছেন, প্রতিনিয়ত এই বিপ্লবী তত্ত্বের উন্নততর উপলব্ধি ঘটিয়ে এবং পদ্ধতিকে প্রতিনিয়ত সঠিক ভাবে অনুসরণ করে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৬ এই ২৮ বছরের মধ্যে শূন্য থেকে শুরু করে সিপিআই-সিপিএমের কমিউনিজমের তকমাকে চুরমার করে দলকে তিনি কোন জায়গায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন! তাঁর মৃত্যুর পর এই ৪৩ বছরে এই দল তাঁর মতো অতি উচ্চ এক মহান নেতার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ভারতের প্রতিটি রাজ্যে একটি বিপ্লবী দল হিসাবে জনগণের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার সঠিকতা প্রতিপন্ন করেই। এই প্রসঙ্গে আরও একজন সর্বহারার মহান নেতা মাও সে-তুঙের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কথাও স্মরণ করাতে চাই। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, যদি একটি বিপ্লবী দলের বেস পলিটিক্যাল লাইন অর্থাৎ মূল তত্ত্বগত বিশ্লেষণ, দলের প্রধান রণকৌশল ঠিক থাকে তা হলে একটি ছোট দলও অনিবার্য ভাবে যথাসময়ে বড় দলে পরিণত হবে। অপরদিকে যদি বড় একটি বিপ্লবী দলের বেস পলিটিক্যাল লাইন ভ্রান্ত হয়, তা হলে সেই দল আর বড় থাকবে না, দ্রুত তার পতন ঘটবে, তার হাতে রাষ্ট্রশক্তি থাকলেও তার অধঃপতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

একই সঙ্গে আমি এই কথাটাও স্মরণ করাব যে, আজ আমরা কিন্তু একেবারে শৈশব অবস্থায় নেই। সারা দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে লাগাতার গণআন্দোলন পরিচালনা করে সাংগঠনিক ভাবে বেশ কিছুটা শক্তি আমরা সঞ্চয় করেছি। আরএসএস-বিজেপি সহ প্রতিপক্ষ অন্যান্য পুঁজিপতি দলগুলিও আমাদের শক্তিবৃদ্ধি টের পাচ্ছে এবং আমাদের শক্তিবৃদ্ধি আটকে দেওয়ার জন্য তারা সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ভবিষ্যতে এরা আমাদের বিরুদ্ধে আরও জোরালো আক্রমণ হানবে, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এদের আক্রমণ প্রতিহত করার একটিই পথ, লাগাতার গণআন্দোলন পরিচালনা করে জনগণের মনে আমাদের স্থান ক্রমাগত সুদৃঢ় করা। আরএসএস-বিজেপির এই অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদী উত্থানকে আমাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সংগ্রাম গড়ে তুলে প্রতিহত করার অপরিহার্যতাকে উপরোক্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেই উপলব্ধি করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণিকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার ঐতিহাসিক কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সর্বহারার মহান নেতা এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৩তম স্মরণ বার্ষিকীতে এটাই হোক আমাদের বিশেষ সংকল্প। দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতি আমাদের আবেদন, আরএসএস-বিজেপির উত্থানকে প্রতিহত করার এই ঐতিহাসিক সময়ে আপনারাও আত্মত্যাগের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসুন। স্মরণ দিবসের এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

রোমিলা থাপারকে সরানোর চক্রান্ত

তীব্র নিন্দা এআইডিএসও-র

দিল্লির জে এন ইউ কর্তৃপক্ষ বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রোমিলা থাপার সহ ১২ জন এমিরিটাস অধ্যাপককে তাঁদের সি ভি (যোগ্যতা জ্ঞাপক প্রমাণপত্র) জমা দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র ২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে এর তীব্র নিন্দা করেছেন। অধ্যাপক থাপার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি সিভি জমা দেবেন না। অবসরের পর খ্যাতনামা অধ্যাপকদেরই এমিরিটাস অধ্যাপক হিসাবে সম্মানজনকভাবে নিয়োগ করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। এমিরিটাস অধ্যাপকরা তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষাগত উৎকৃষ্টতা দিয়ে কাজ করে থাকেন। তাঁদের এ ধরনের চিঠি পাঠানো চূড়ান্ত অসম্মানজনক। বর্তমানে ৮৭ বছর বয়সেও তিনি সক্রিয়ভাবে গবেষণা, শিক্ষাদান, বই লেখা, বহু ওয়ার্কশপ পরিচালনা যোগ্যতার সাথে করে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে তাঁর যোগ্যতা নথিভুক্ত রয়েছে। কর্তৃপক্ষ চাইলেই তা দেখতে পারে। তা সত্ত্বেও সি ভি দেওয়ার ফরমান কেন?

বিবৃতিতে অশোক মিশ্র বলেছেন, অধ্যাপক থাপার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার বেসরকারিকরণের নীতির ঘোরতর বিরোধী। বিজেপি-আরএসএস কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহার করে যেভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে তিনি তার তীব্র সমালোচক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার হরণের বিরোধী। গেরুয়া শিবিরের অপকর্মের সামনে তিনি এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এঁদেরকে সরিয়ে দেওয়াই বিজেপির হীন মতলব। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কমরেড মিশ্র আহ্বান জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ পুঁজিমালিকদের স্বার্থেই

তিনের পাতার পর

টাকা নতুন করে ব্যাঙ্কগুলিকে দিচ্ছে, যাতে এনপিএ-র ধাক্কা সামলে ব্যাঙ্কগুলি আবার পুঁজিপতিদের ঋণ দিতে পারে। কিন্তু যে ব্যাঙ্ক সামান্য কয়েক হাজার টাকা ঋণ আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করে, তারা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে পুরনো ঋণ আদায়ের কথা তুলছেই না। সরকার নতুন দেউলিয়া আইনের অজুহাতে ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ আদায়ের জন্য পাঠাচ্ছে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনালে। বিজেপি সরকারের নির্দেশে ট্রাইবুনাল ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্য করছে ঋণের বড় অংশ ছেড়ে দিয়ে পুঁজিপতিদের সাথে একটা সমঝোতা করে নিতে। ব্যাঙ্কে থাকা গরিব জনসাধারণের কষ্টার্জিত টাকা এই পথে বেশি বেশি করে ঢুকছে পুঁজিপতিদের সিন্দুকে। এর ফলে যে এনপিএ-র ভারে নুব্জ্য দুর্বল ব্যাঙ্কগুলির দায়ের বোঝায় অপেক্ষাকৃত সবল ব্যাঙ্কগুলিও ডুবতে পারে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করছে ব্যাঙ্ককর্মী সংগঠনগুলি। সরকারের তাতে কী? তারা যাদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করে সেই একচেটিয়া মালিকদের লাভ হলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ। দেশের অধিকাংশ মানুষের সঞ্চয়কে সরকার ভারতের একচেটিয়া মালিকদের হাতে পুঁজি হিসাবে তুলে দিতে চাইছে। এই একজোট করা পুঁজির জোরে এদেশের একচেটিয়া মালিকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী নখ-দাঁত আরও তীক্ষ্ণ করে এশিয়া আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বড় সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর হিসাবে যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায় তারা বিপুল লাভ ঘরে তুলবে। বিনিময়ে গোটা ভারতের জনগণ বিশ্বের শোষিত শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর অভিশাপের ভাগী হবেন। বিজেপির উপহার দেওয়া তথাকথিত 'শক্তিশালী ব্যাঙ্ক' দেশের মানুষের কোনও উপকার করবে না, করবে এদেশের পুঁজিপতি শ্রেণির। তাছাড়া এই পথেই একদিকে সরকার ব্যাঙ্কে তার নিজের শেয়ার কমাতে কমাতে ব্যাঙ্কগুলিকে পুরোপুরি বেসরকারি হাতে দিয়ে দেবে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারি শেয়ার ৫১ শতাংশ নেমেছে। আরও নামবে বলে ঘোষণা আছে। বিজেপি সরকার এই পথেই এফআরডিআই (ফিনান্সিয়াল রেজোলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স)-এর মতো মারাত্মক বিলকেও ওই সংযুক্তিকরণের পর সংস্কারের অজুহাতেই চালু করার চেষ্টায় আছে। এই অপচেষ্টারই অপর নাম ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ।

প্রকাশিত হল
অনুশীলন সম্পর্কে
মাও সে-তুং
দাম ঃ ১০ টাকা
সংগ্রহ করুন

বিজেপি সরকারের গ্যাসে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ

২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

গরিবি-বেকারিতে জেরবার জনগণ

একের পাতার পর

তেল-গ্যাসের ব্যবসার বেশিরভাগটাই তাদের হাতে তুলে দিয়েছে আগেই। নতুন জমানার প্রথম ১০০ দিনে মোদিজি তার সঙ্গে যোগ করেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য রান্নার গ্যাসের ভর্তুকিটা নিঃশব্দে লোপাট করে দেওয়ার কারসাজি।

আর কী করেছেন? শ্রম আইন সংস্কার করে মালিকদের হাতে ইচ্ছামতো ছাঁটাই করা, বেতন কমানোর অধিকার দিয়েছেন। ইএসআই তুলে দেওয়ার পথে হেঁটে, পিএফের জমা টাকা মালিকদের লাভের জন্য খাটানোর ব্যবস্থা করে তাদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। মালিকদের জন্য মোদি সাহেবদের ১০০ দিনের সাফল্য সত্যিই বলবার মতো। বিগত পাঁচ বছরে তাঁদের জমানায় ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে জমা হয়েছে দেশের সম্পদের ৭৭ শতাংশ। জনসংখ্যার প্রায় ৬৭ শতাংশ মানুষ অতল দারিদ্রের গহ্বরে নিমজ্জিত। নতুন দফার ১০০ দিনে এই বৈষম্য আরও বাড়ছে। সাধারণ মানুষের হাতে সামান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনারই টাকা নেই। শিল্পদ্রব্য কিনবে কে? চাহিদা নেই বলে সারি সারি কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। বেড়ে চলেছে জনজীবনের সংকট। অর্থনীতি মন্দার করাল গ্রাসে। গাড়ি শিল্পেই ১০ লক্ষ লোক ছাঁটাইয়ের কোপে, রেলে সরকার নিজে সাড়ে তিন লক্ষ কর্মচারীকে ছাঁটাই করছে। এর মধ্যেই ১৪ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে শেয়ার বাজার (ইকনমিক টাইমস ডট কম ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। ফলে ছাঁটাই আরও বাড়বে। চাষে এমনিতেই সংকট, এর উপর নানা জায়গা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরতে শুরু করায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে বেকারি মারাত্মক বাড়ছে। ৪০ কোটির বেশি শ্রমিক অতি সামান্য মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। সেই মজুরি এত সামান্য যে নেই বললেই হয় (পিইডব্লু রিসার্চ সেন্টার,ওয়াশিংটন, মার্চ ২০১৯)। ভক্তের দল আওয়াজ তুলেছে 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'— মোদি থাকলে সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে! কিন্তু মোদিজি থেকে শুরু করে অমিত শাহ কিংবা তাঁদের অর্থমন্ত্রী— সকলের ভাব দেখে মনে হয় তাঁরা এত মহান চিন্তায় ব্যস্ত যে, দেশের মানুষের খাওয়া-পরার মতো তুচ্ছ বিষয়ে তাঁদের ভাবতে বলাই অপরাধ!

তাহলে ১০০ দিনে কিছুই কি করেননি তাঁরা? অবশ্যই করেছেন। এক মাসের বেশি হয়ে গেছে কাশ্মীর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। ফোন বন্ধ, খবর আদানপ্রদান বন্ধ, স্কুল-কলেজ বাজার-হাট, হাসপাতালের স্বাভাবিক পরিষেবা সব বন্ধ। যতটুকু খবর বাইরে আসছে তাতে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার কোনও লক্ষণ কাশ্মীরের নেই। কাশ্মীর নিয়ে সারা দেশে বিজেপি এত লম্ফঝম্প করছে, অথচ কাশ্মীরের মানুষের মত নেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর একবারও মনে হল না। গণতন্ত্র ফেরানোর চেষ্টা দূরে থাক, সামরিক বাহিনীর দাপটের উপরই ভরসা সরকারের। আসামের ১৯ লক্ষের বেশি ভারতবাসীকে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিয়ে সারা দেশে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভেদের জিগির তুলতে ব্যস্ত বিজেপি সরকার। ত্রিপুরায় এর মধ্যেই বিজেপি সরকার এই ডামাডোলের সুযোগে গরিব মানুষের হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত, সার্বজনীন শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিতে ১০০ দিনের 'সাফল্যে' যোগ হয়েছে সর্বনাশা শিক্ষানীতি।

নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহদের কথা থেকে আবার একটা সত্য সামনে এল, কোনও কিছু গড়া সময়সাপেক্ষ, ভাঙাটা সহজ। বিজেপির বেতনভোগী এবং প্রসাদভোগী 'ভক্ত'বাহিনী এই দুই প্রধান কুশীলবের আস্ফালনের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানুষে মানুষে ঐক্য ভাঙতেই ব্যস্ত। তাই বহু বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যকেও অল্পদিনেই ভাঙতে নেমেছেন তাঁরা। ভোটের আগে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিলেন তাঁরা। জেতার পর, ১০০ দিনের মধ্যেই 'বিজেপি ভক্ত'বাহিনী নবজাগরণের উদগাতা রামমোহনকে ব্রিটিশের দালাল বলেছে। বিজেপির জয়রথের ধাক্কায় কাশ্মীরে, আসামে মানুষের ঘর ভেঙেছে। সারা দেশে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে তারা ভাঙছে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের জীবনের সুস্থিতি। তাকতদার বটে!

ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি

একের পাতার পর

যায়। তৃতীয়ত, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টানেল খননের গতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রেও জরুরি কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। সংবাদে এ-ও প্রকাশিত যে, টানেল খননে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ কিছু নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। চতুর্থত, বালিস্তর খুবই বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও এই স্তর দিয়েই টানেল করা হল কেন?

মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের দাবি— ১) ভূগর্ভস্থ টানেলের কারণে মালিক ও ভাড়াটে সহ বিপর্যস্ত সমস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ২) ভবিষ্যতে এ ধরনের আর কোনও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা যাতে না থাকে তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com